আসামের জাতিদাঙ্গা বিষয়ে

মন্থন সাময়িকী জুলাই আগস্ট ২০১২ সংখ্যা

প্রকাশিত হতে চলেছে

সংগ্রহ করুন

যোগাযোগ : জিতেন নন্দী (০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬)

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 6 16 September 2012 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ রবিবার ২ টাকা

• বিহারী লোকগান পৃ ২ • নয়া মোবাইল বিধি পৃ ২ • ডেঙ্গু পৃ ২ • মানেসর ডায়েরি পৃ ৩ • অটো পৃ ৩ • ভ্যানরিক্সা পৃ ৩ • ঘোড়ামারা পৃ ৪ • স্বাস্থ্য পৃ ৪

কুডানকুলামের মৎস্যজীবীদের ওপর লাঠি, গ্যাস, গুলি, তবু আন্দোলন অটুট

পুলিশের গুলিতে নিহত এক মৎস্যজীবী, পঞ্চাশের বেশি গ্রেফতার, ‘নেতাদের খুন করে আন্দোলন শেষ করে দিতে চাইছে রাষ্ট্র’

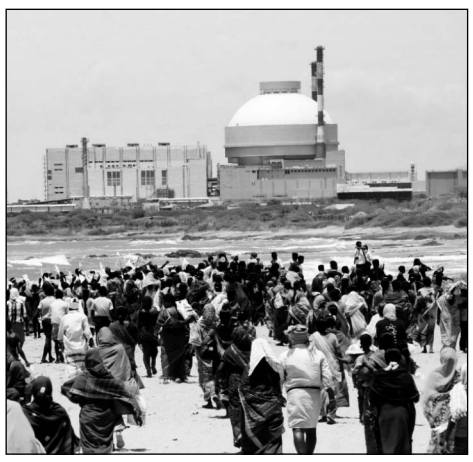

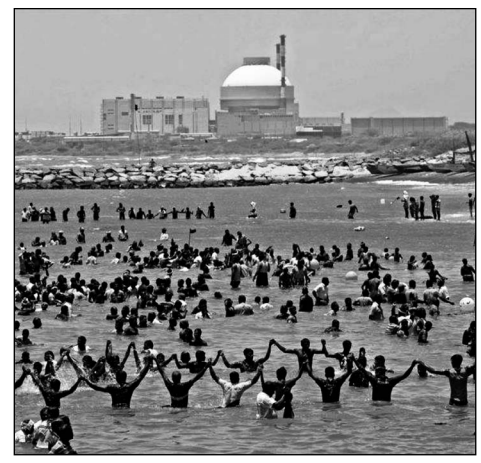

(বাঁদিক থেকে) ৯ সেপ্টেম্বর পরমাণু প্রকল্পের দিকে গ্রামবাসীদের মিছিল; ১০ সেপ্টেম্বর পুলিশি পীড়নের শিকার জেভিয়ার আম্মা; ১১ সেপ্টেম্বর ইদিনথাকারাই গ্রামে গ্রামবাসীদের সভায় ফের লড়াই-এর শপথ; ১৩ সেপ্টেম্বর ফের পরমাণু প্রকল্পের সামনের সমুদ্রে জল সত্যাগ্রহ। ছবি অ্যান্টনি কেবিস্টন ফার্নান্ডো-র তোলা।

ডায়ানিউক ডট অর্গ সূত্র থেকে সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ৯ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর •

একবছরের ওপর চলা অহিংস জনপ্রতিরোধকে উপেক্ষা করে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ৩১ আগস্টের রায়কে সামনে রেখে ১০ সেপ্টেম্বর কুডানকুলামের পরমাণু চুল্লিতে জ্বালানি সংযোগের দিন স্থির করে পরমাণু কর্তৃপক্ষ। তার প্রতিবাদে ৯ সেপ্টেম্বর অহিংস ‘প্রকল্প দখল’ অভিযান করে কুডানকুলামের হাজার হাজার গ্রামবাসী। সকাল ৭ টার মধ্যেই আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে সমুদ্রপথে নৌকায় করে হাজার পাঁচেক গ্রামবাসী চলে আসে আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ইদিনথাকারাই গ্রামের সেন্ট লুর্ডস চার্চের কাছে। বেলা এগারোটায় চার্চে প্রার্থনার পর শুরু হল মিছিল। মিছিল শুরুর সময় বক্তব্য রাখেন এস পি উদয়কুমার। প্রায় দশ হাজার মানুষ চলতে শুরু করে এক কিলোমিটার দূরের পরমাণু চুল্লির দিকে। সকাল ১১.৪০ নাগাদ মিছিল গিয়ে কুডানকুলাম পরমাণু চুল্লির পূর্ব দিকের দেওয়ালের থেকে কয়েকশ’ ফুট দূরে বসে পড়ে। প্রায় তিন হাজার পুলিশ জায়গাটা পাহারা দিচ্ছিল। খবর মেলে, পেরিয়া থালাই গ্রাম থেকে ইদিনথাকারাই গ্রামে মিছিলে যোগ দিতে আসা কয়েক হাজার মানুষকে আটকে দিয়েছে পুলিশ। ফলে সেখানকার লোকে এখন তুতিকোরিনের পানি মায়া মাধা চার্চের সামনে অনশনে সামিল হয়েছে। তুতিকোরিনের মৎস্যজীবীরা ওখানে আগে থেকেই একটি অনশনে সামিল রয়েছেন।

খানিক পরে জেলাশাসক এসে উদয়কুমারকে খোঁজ করেন, তার সাথে কথা বলার জন্য। কিন্তু লোকে চাইছে, উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে কথা বলতে, প্রশাসনিক লোকেদের সাথে কথা বলতে চাইছে না। উদয়কুমার ঘোষণা করেন, ‘আমরা সমুদ্রের তীরে কুডানকুলাম পরমাণু চুল্লির দখল নিয়েছি। আমরা পেরেছি পুলিশকে এড়িয়ে, কোনও দুর্ঘটনা এড়িয়ে এতদূর চলে আসতে। আমরা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আমাদের সাথে কথা বলতে। অনুগ্রহ করে এখানে আমাদের দেখতে আসুন। আপনাকে আমাদের দরকার।’

সন্ধ্যের পর পুলিশ কমে যায়। আন্দোলনকারীরা মনে করে, সরকার আবার তাদের আমল দিতে চাইছে না। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, ওখানেই রাত কাটাবে। সমুদ্রের ধারে বালির মধ্যে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানোর বন্দোবস্ত হয়। হাজার হাজার মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সেখানে থাকে।

১০ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই অকুস্থলে জড়ো হয়ে যায় প্রায় চার হাজার পুলিশ। সকালেই সশস্ত্র পুলিশ চলে আসে আন্দোলনকারীদের নাকের ডগায় এবং সকাল ১০.৩০ নাগাদ একদফা লাঠিচার্জ শুরু করে। কিছুটা ধস্তাধস্তি হওয়ার পর পুলিশ সংবরণ করে। কিন্তু ব্যাটনধারী পুলিশের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে যায় দাঙ্গা-পুলিশ এবং টিয়ার গ্যাসের শেল নিয়ে পেছনে দাঁড়ায় আর একদল।

এর কিছু পরে দু-জন যুবক একটা ফাইবারের নৌকা নিয়ে সমুদ্র দিয়ে কুডানকুলাম পরমাণু প্রকল্পের দিকে এগিয়ে যায়। আন্দোলনকারীরা এর বিরুদ্ধে, তাই তারা পুলিশের অনুমতি নিয়ে ওই দু্জনকে ধরে ফেলে এবং তাদের নিরস্ত করে ও তাদের আন্দোলনের জায়গায় ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তিরুনেলভেলির পুলিশ সুপারের আদেশে ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। আন্দোলনকারীরা এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই সময় ১১.৩০ নাগাদ ওই পুলিশ সুপার বিজয়েন্দ্র বিদারি আদেশ দেয়, দশ মিনিটের মধ্যে প্রতিবাদকারীদের জায়গা খালি করে দিতে হবে, নচেত পুলিশ তাদের অ্যাকশন শুরু করবে।

মেয়েরা কুডানকুলাম চুল্লির দিকে প্রথম ব্যারিকেড লাইন তৈরি করে। বাচ্চারা এবং পুরুষেরা সমুদ্রের তীর বরাবর লাইন করে দাঁড়িয়ে যায়, কুডানকুলাম প্রকল্প থেকে ইদিনথাকারাই গ্রাম বরাবর। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের ডিআইজি রাজেশ দাস পুলিশকে আদেশ দেয়, ব্যারিকেডের মাঝখানে চলে যেতে, যাতে পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা করে ফেলা যায়। টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারের মধ্যে দিয়ে মানুষ দেখতে পায়, ১০ মিনিট সময়সীমা শুরু হতে না হতেই পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে। একজন আন্দোলনকারীর বয়ান,

—একজন পুলিশ দুইজন যুবক স্বেচ্ছাসেবীকে ধাক্কা দিয়েছে এই নিয়ে একটি ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কয়েকজন মহিলা পুলিশকে চিৎকার করে কিছু বলতে থাকে এবং তাদের কেন্দ্র করে অনেক আন্দোলনকারী জড়ো হয়ে যায়। তখন সেখানে কিছু পুলিশ ছুটে যায় এবং লাঠি চালাতে শুরু করে। আমরা কিছু বোঝার আগেই আমাদের মধ্যিখানে কাঁদানে গ্যাসের শেল এসে পড়ে।

বিশালসংখ্যক পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং লাঠি চালাচ্ছে। এই অবস্থায় পুলিশের লাঠি এবং সমুদ্রের মাঝখানে পড়ে গিয়ে মেয়েরা এবং অন্যান্যরা সমুদ্রের বালি তুলে নিয়ে পুলিশের দিকে ছুঁড়তে থাকে তাদের লাঠির আঘাত প্রতিহত করার জন্য। অনেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। ক্যামেরায় দেখা যায়, র‍্যাফ তাদের দিকে চটি, লাঠি এবং পাথর ছুঁড়ছে। পুলিশ শাসাতে থাকে, পাড়ে এলেই তোরা মরবি। একসময় একজন যুবকের হাতে মোবাইল দেখে এক পুলিশকর্মী চিৎকার করে ওঠে, ওই দ্যাখ, হাতে বোমা। আরেকজন পুলিশটিকে গিয়ে বলে, না না, ওটা মোবাইল।

আন্দোলনের এক নেতা এবং স্থানীয় কাউন্সিলর সহায় ইনিথাকে পুলিশ টার্গেট করে পেটায়। সে গুরুতর আহত হয়। উদয়কুমার একটি টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন, তার দিকে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি চালিয়েছে, মাথা নিচু করে নেওয়াতে তিনি বেঁচে গেছেন। আশেপাশে যারা ছিল, তারা এটা সমর্থন করে — উদয়কুমার যখন একটি ফাইবার বোটে চেপে ওই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ।

বেশ কিছু মিডিয়ার লোক পুলিশের হাতে আহত হয়। টাইমস নাউ-এর এক সাংবাদিককে টার্গেট করে পেটায় পুলিশ।

এরপর তিনের পাতায়

নর্মদা নদীর বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা আন্দোলনে

মধ্যপ্রদেশে জল সত্যাগ্রহী গ্রামে ১৪৪ ধারা, গ্রেফতার ২৪৫

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, সূত্র নীলা হার্ডিকর, ঘোঘোলগাঁও, মধ্যপ্রদেশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, হরদা-তে জল সত্যাগ্রহের ছবি ইন্টারনেট সূত্রে পাওয়া •

নর্মদা নদীর ওপর বাঁধের জলস্তরের উচ্চতা বাড়ানোর বিরুদ্ধে জলে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিবাদ করছে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা।

গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ জুড়ে বয়ে চলা নর্মদা নদীর ওপর অনেক জায়গায় বড়ো বড়ো বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা এবং চাষের জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই। ১৯৬১ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে এসেছে নদীর দুই পারে থাকা মানুষ, কারণ বাঁধ দিলে সেই বাঁধ থেকে জল ছাড়ার সময় আশেপাশের গ্রাম ভেসে যায়। ১৯৭৯ সালে শুরু হওয়া সর্দার সরোবর প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনের থেকেই গড়ে উঠেছে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। প্রায় ৩০টি অতিকায় বাঁধ নির্মাণ, এবং প্রতি বছর সেই বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর এই প্রকল্প চলছে। বাঁধ দেওয়ার ফলে এবং দফায় দফায় বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর ফলে নদীতীরবর্তী অঞ্চলে জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে উচ্ছেদ হয়েছে মানুষ। তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা সরকারি ঘোষণায় থাকা সত্ত্বেও প্রায় তার কিছুই পালন করা হয়নি।

সম্প্রতি এইরকমই ওঙ্কারশ্বের নামে একটি বাঁধ, যা ২০০৭ সালে চালু হয়, তার উচ্চতা বাড়ানোর (১৮৯ মিটার থেকে ১৯৩ মিটার করার) তোড়জোড় চলছিল। এর ফলে ভেসে যেতে বসা দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশের খানদোয়া অঞ্চলের গ্রাম ঘোঘোলগাঁও-এর অধিবাসীরা ‘জল-সত্যাগ্রহ’-তে সামিল হয়। ২৫ আগস্ট সরকার বাঁধের জলের উচ্চতা বাড়াতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে ২৮ জন পুরুষ এবং ২৪ জন মহিলা ওই বাঁধের জলে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে আরও ১৫০ জন একটি মঞ্চ বানিয়ে ধর্নায় বসে। জলের উচ্চতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জল-সত্যাগ্রহীদের বুক অবধি পৌঁছে যায় জল। সরকার ততক্ষণে ততক্ষণে বাঁধের জলের উচ্চতা ১৮৯ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১৯০.৪ মিটার করে ফেলেছে। একেকজন জল-সত্যাগ্রহী গড়ে ২০ ঘন্টা করে জলে থাকছিলেন। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেত্রী চিত্ররূপা পালিত জানান, গ্রামবাসীরা বাঁশের সাহায্যে জলে দাঁড়িয়ে থাকছিলেন, দু’বেলা খাওয়া এবং শৌচাগারে যাওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তাদের পায়ের তলায় ঘা হয়ে যেতে শুরু করে।

এরপর তিনের পাতায়

কোকরাঝোড় থেকে সরেজমিনে

অ-বোরোদের পক্ষে পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক

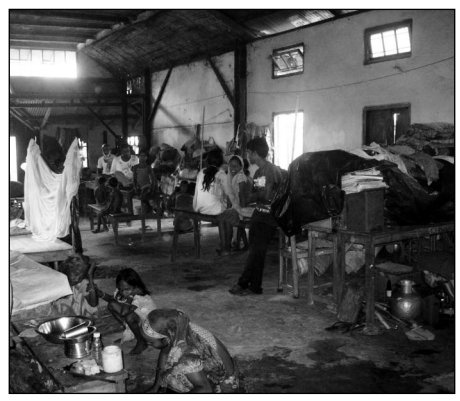

জিতেন নন্দী, কোকরাঝোড়, ১৪ সেপ্টেম্বর। ছবি জিতেন নন্দীর তোলা •

গতকাল, আমি, রামজীবন, হেলালউদ্দিন ও কামরুজ্জামান গোসাইগাঁও ও ধুবড়িতে কতকগুলো শিবির ঘুরে দেখেছি। তার আগেরদিন যখন আমরা কোকরাঝোড় পৌঁছালাম, তখন দেখলাম, স্টেশনে এবং শহরের সব জায়গায় পোস্টার সাঁটা আছে। পোস্টারে লেখা ছিল, ‘বাংলাদেশীদের বয়কট করো, নাহলে শাস্তি দেওয়া হবে’। অর্থাৎ অ-বোরোদের পক্ষে পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক এবং উদ্বেগজনক।

গতকাল সকালে আমরা শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে রওনা দিয়ে আক্রান্তদের ত্রাণশিবিরগুলো দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, সরকারী উদ্যোগে, যাদের জমির পাট্টা আছে, তাদের ফোটো তোলা হচ্ছে। এর ফলে ত্রাণশিবিরে একটা আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। কারণ গ্রামগুলোতে অনেক অধিবাসী আছে, যারা কয়েকপুরুষের বাসিন্দা, কিন্তু তাদের কোনও জমির পাট্টা নেই। আসলে আসাম সরকার ১৯৮৬ সাল থেকেই জমির পাট্টা নথিভুক্ত করা বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে অনেকেই আছে, যারা জমি কিনেছে, কিন্তু কেনা জমির কোনও সরকারি রেকর্ড নেই। সরকার বলছে, তিন কিস্তিতে ত্রাণশিবিরের লোকেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। প্রথম কিস্তিতে যাদের জমির পাট্টা আছে তাদেরকে গ্রামে ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা, যারা ত্রাণশিবিরে আছে, তারা বলছে যে তারা একসঙ্গেই গ্রামে ফিরবে।

আজকে ‘অল বোরো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন’-এর পক্ষ থেকে কোকরাঝোড়ে একটা সভা ডাকা হয়েছে। যদিও বৃষ্টি হচ্ছে, তবুও স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এবং অঞ্চলের মানুষরা অনেকেই খালি পায়ে হেঁটে, দলে দলে সভায় এসে যোগ দিচ্ছে।

সম্পাদকের কথা

কেন সকালে উঠে লোকে এসব পড়বে?

কাগজ খুলতেও হয় না। হাতে নিলেই ধর্ষণ, খুন আর আত্মহত্যা। প্রথম পাতাতেই বড়ো বড়ো করে এইসব অত্যাচার আর নিগ্রহের খবর। ইদানিং এটাই বড়ো কাগজগুলোর দস্তুর। সঙ্গে ফলাও করে ফটো আর ছবি। কোথাও পাথরের চাতালে থ্যাঁতলানো দেহ, কোথাও ঘরের কোণায় রক্তের দাগ, কোথাও আবার পেশাদারি শিল্পীর আঁকা স্কেচে অঘটনের খুঁটিনাটির বিশদ বৃত্তান্ত। দেখলে চোখের জল পর্যন্ত শুকিয়ে যায়।

কেন সকালে উঠে লোকে এসব পড়বে? পয়সা খরচ করে সংবাদপত্র কেনা কি ভয় পাওয়ার জন্য? ব্যাপারটা ভাবার মতো।

এমনিতেই সাধারণ মানুষ নানারকম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটায়। কেউ ভাবে আজ কাজ চলে যাবে কিনা, কেউ ভাবে আজ কাজ পাবে কিনা। কেউ ভাবে কাল ধার শোধ করবে কীভাবে, কেউ ভাবে কাল ধার জোগাড় করবে কীভাবে? কেউ হাসপাতালে–ডাক্তারখানায় উদ্বিগ্ন মুখে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার কী বলবে, কেউ স্কুলের দরজায় বসে চিন্তা করছে, পরীক্ষার ফল ভালো হবে তো? গোটা দেশ, গোটা সমাজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে — ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা। সমষ্টিগত চেহারাও আছে তার। কিন্তু সে বড়ো আবছা। এমন আদল সে পাচ্ছে না যাতে অনিশ্চয়তার ভাবটা কিছু কাটে।

তাইতো সবাই ছুটছে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্যে। সেটাকেই কি বাড়িয়ে তুলতে চাইছে বড়ো বড়ো খবরের কাগজগুলো? তাই কি ধর্ষণ–খুন–আত্মহত্যার খবরের এত রমরমা? দুঃখজনক ওই সমস্ত ঘটনাগুলো ভিতরের পাতার ছোটো জায়গা থেকে এতটা বড়ো করে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে আমাদের সন্ত্রস্ত জীবনে আরও বেশি আশঙ্কা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য? অথবা, মানুষের ভিতরের সুকুমার প্রবৃত্তিকে শুকিয়ে দিয়ে মর্ষকামী প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলার আরও কোনও ভয়ঙ্কর আয়োজন চলছে?

এই মাস থেকে মোবাইল ও টাওয়ার বিকিরণের নয়া বিধি চালু করল কেন্দ্র

শমীক সরকার, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর •

সেপ্টেম্বর মাস থেকে মোবাইল বিকিরণের নয়া বিধি চালু করেছে কেন্দ্র। এই নয়া গাইডলাইন অনুসারে মোবাইল বিকিরণের নিরাপদ সীমা কমানো হল, আইসিএনআইআরপি প্রণীত এবং এতদিন ধরে ভারতে স্বীকৃত সীমার এক দশমাংশ করা হল। অর্থাৎ এতদিন তা ছিল ৯.২ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে। এখন তা হবে ০.৯২ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে। উল্লেখ্য, আগের সীমাটি কেবলমাত্র মোবাইল বিকিরণের তাপীয় ফলকে বিবেচনায় নিয়েই করা হয়েছিল, এর অ–তাপীয় কোষগত ফলকে বিবেচনায় আনা হয়নি বলে সমালোচনা করছিলেন বিশেষজ্ঞ এবং সমাজকর্মীরা।

পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে নিজেদের মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণের শংসাপত্র দিতে আগেই বলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এবার সেই শংসাপত্র বিচার করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো 'টেলিকম এনফোর্সমেন্ট রিসোর্স এন্ড মনিটরিং সেল' বা সংক্ষেপে টিইআরএম–কে। যারা অভিযুক্ত সমস্ত টাওয়ার এবং অন্যান্য আরও দশ শতাংশ টাওয়ারের বিকিরণমাত্রা নিজেরা তদন্ত করবে এবং তা কোম্পানির দেওয়া স্ব–শংসাপত্রর সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে। যদি না মেলে তাহলে টাওয়ার প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা হবে কোম্পানির।

এছাড়া মোবাইল হ্যান্ডসেটের বিকিরণের বিধির ব্যাপারেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন : মোবাইল হ্যান্ডসেটের এসএআর ২ ওয়াট/কেজি (দশ গ্রাম মানব শরীরের কোষ বিবেচনায় এনে) ছিল। তা কমিয়ে করা হয়েছে ১.৬ ওয়াট/কেজি (এক গ্রাম মানব শরীরের কোষ বিবেচনায় এনে)। চালু মোবাইল সেটগুলির ব্যবহার করা যাবে আগামী একবছর। কিন্তু নতুন তৈরি করা সেটগুলির এসএআর নতুন সীমায় রাখতে হবে। এই এসএআর সীমা হ্যান্ডসেট–এ লেখা থাকতে হবে এবং বিক্রির সময় ক্রেতাকে জানাতে হবে। উল্লেখ্য, এর ফলে হ্যান্ডসেটের বিকিরণমাত্রার সীমা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমান করা হল। এছাড়া আরও বলা হয়েছে, হ্যান্ডসেটের সঙ্গে দেওয়া পুস্তিকাতে হ্যান্ডসেট সম্পর্কিত সতর্কীকরণ লেখা থাকতে হবে। সমস্ত হ্যান্ডসেটের সঙ্গে কানে মোবাইল না লাগিয়ে কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় ইয়ারফোনের বন্দোবস্ত থাকতে হবে।

এই নয়া বিধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকার মোবাইল বিকিরণের মাত্রা পরীক্ষা করার পদ্ধতিরও পরিবর্তন করেছে।

সল্টলেকে ডেঙ্গুর আতঙ্ক

মিত্রা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর •

কলকাতার অন্যতম সুপরিকল্পিত উপনগরী সল্টলেক। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের বাস। সাজানো বাড়ি। পার্ক। তবু ডেঙ্গুর প্রকোপ সেখানেই বেশি। এই রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এখানকার মানুষ। ২২৫টি ঘরে ডেঙ্গুর লার্ভা। আগস্টের শুরু থেকেই ঘরে ঘরে জ্বর। রক্তপরীক্ষার (Dengu NS1 Antigen) প্রাথমিক পর্যায়েই ৮০ শতাংশ লোকের দেহে ধরা পড়তে লাগল ডেঙ্গুর উপস্থিতি। প্যাথলজিক্যাল ল্যাবগুলিতে রোগীর ভিড়। শুধু রক্ত দিতেই বসে থাকতে হচ্ছে এক থেকে দেড় ঘন্টা। তারপর সেই রিপোর্ট আনতেও একই অবস্থা। বেশি জ্বরে, ক্লিনিকের কর্মীরা, সকাল থেকে সন্ধ্যে রোগীর বাড়ি বাড়ি রক্ত সংগ্রহের জন্য এল। কিন্তু এ সবই সচেতন মানুষের বেসরকারি উদ্যোগের সাহায্য নেওয়া। সল্টলেক লাগোয়া গরীব ঘন–জনবসতির জন্য কিছু নেই। সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনও সাড়া ছিল না।

ডাক্তারের পরামর্শে অনেকেই শরণাপন্ন হল কাছাকাছি বেসরকারি হাসপাতালে। প্রথম দিকে রোগীর ভর্তি ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত থাকলেও পরে রোগীর সংখ্যা বাড়লে তাদের ফিরিয়ে দিল হাসপাতালগুলি। জায়গা নেই বলে। ক্রমশ রক্ত দুষ্প্রাপ্য হতে লাগল যা অনিবার্য, কারণ, ডেঙ্গু রোগীর রক্তে প্লেটলেট কাউন্ট বা অনুচক্রিকার সংখ্যা কমে গেলে রক্ত লাগে।

বিধাননগরে জনবাসীর চোখে আতঙ্ক। দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তার প্রতিফলন। এবার পৌরসভার সাড়া পড়ল। ক্রমাগত ডেঙ্গুর প্রকোপের তথ্য অস্বীকার করে যাবার পর কিছুটা সচেষ্ট হতে দেখা গেল পৌরসভাকে। সচেতনতা বাড়াতে বাড়িতে বাড়িতে র‍্যাপিড ফোর্স পাঠান, মশা মারার তেল, ধোঁয়া, এবং ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর ব্যবস্থা শুরু হল।

এসডিও মলয় মুখোপাধ্যায় জানান, র‍্যাপিড ফোর্স সার্ভে করে ২২৫টি বাড়িতে ডেঙ্গুর লার্ভা খুঁজে বের করেছে। আগেই নির্ধারণ করা হয়েছিল, ডেঙ্গুর লার্ভা যেসব বাড়িতে পাওয়া যাবে, তাদের বাড়ি পরিষ্কার করার নোটিশ দেওয়া হবে। সেই অনুসারেই উপরোক্ত বাড়িগুলিতে নোটিশ দেওয়া হয়। এদের নোটিশ দেওয়ার পরও যদি লার্ভা পরিষ্কার না করা হয়, তাহলে হাজার টাকা ফাইন করা হবে বলে জানান এসডিও। তারপরেও যদি কোনও বাড়ি সচেতন না হয়, তবে তাদের দিন প্রতি আরো ৫০ টাকা করে ফাইন করা হবে।

সার্ভে করে দেখা গেছে, সিপিডব্লুডি কোয়ার্টারে ৪০০–র বেশি কন্টেনারে মশার লার্ভা, এফডি (সেখানেই পৌরসভার অফিস), ইডি ব্লকগুলিতে একশ'রও বেশি কন্টেনারে মশার লার্ভা এবং পঞ্চাশের বেশি কন্টেনারে লার্ভা পাওয়া গেছে এএল, জিডি, ইসি, সিকে, এফই, সিজি, বিজি, বিএফ ব্লকগুলিতে। মশার এই প্রকোপে জনগণকে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হতে বলেছেন পৌরপ্রধান।

কিন্তু সল্টলেকের পরিত্যক্ত জমির জঞ্জালের স্তূপে ও জমা জলে মশার সুখের সংসার। বিধাননগরে বাড়ি বাড়ি র‍্যাপিড ফোর্স পাঠিয়ে মশার লার্ভা খোঁজা হচ্ছে। অপরদিকে সকলের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে ভ্যাকেট প্লট। এখনও সল্টলেকে অনেক প্লট রয়েছে যা পরিত্যক্ত। কোথাও অর্ধেক কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়ে পড়ে আছে, কোথাও আগাছার জঙ্গল বর্ষায় আরও ঘনিয়ে উঠেছে। সল্টলেক আধুনিক হয়ে উঠলেও জঞ্জাল ফেলা নিয়ে এখনও সচেতন হয়ে উঠতে পারেনি। তাই পরিত্যক্ত জমিগুলিতে জঞ্জাল ফেলে সেখানে এক অঘোষিত ডাস্টবিন গড়ে ওঠে। বেশিরভাগ ভ্যাকেট প্লট তাই জঞ্জালের স্তূপের ক্ষত নিয়ে দিন কাটায়। জঞ্জালে ডাবের খোলার রাজত্ব। এদিকে পৌরপ্রচারে ডাবের খোলার জমা জলে মশার বংশবৃদ্ধি নিয়ে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু যে হাল সেই হালই রয়ে যাচ্ছে। মশার উৎপাত যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা এবারের ডেঙ্গু প্রকোপ প্রমাণ করল।

এডিস মশা যেভাবে এই বর্ষায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল তাতে জঞ্জাল ফেলা নিয়েও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বিহারী লোকসঙ্গীতের আসরে

সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর •

দুপুরবেলা, মধ্যাহ্ন পার হতে চলেছে। বামুনপাড়া বাজারের দোকান সব বন্ধ হয়ে আসছে। মাছওয়ালা–সবজিওয়ালারা দু–একজন এখনও বসে আছে। বিক্রির আশাতে। বাজারমুখী খদ্দেরদের আসা অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় মানুষের আনাগোনা, চলাচল কমে আসছে। একটু পরেই ফাঁকা হয়ে যাবে, সেই সময়ে দু–একজন মানুষকে যাতায়াত করতে দেখা যাবে। হেলেদুলে চাকার ক্যাঁচর–ক্যাঁচর শব্দে বয়েল গাড়ি নিয়ে, মিছরিলাল বামুনপাড়া বাজারের উত্তরদিকের রাস্তা ধরে বেলেঘাটার কয়লা ডিপোয় নিজের ডেরায় পৌঁছাবার পথেই যেতে যেতে হাতটা কানে নিয়ে, বাঁ হাতের তালু দিয়ে বাম কানটা আলতোভাবে ঢেকে বেসুরো গলায় গান গাইতে শুরু করে দিল। কোনও তাড়া নেই চাবুক মেরে বয়েল হাঁকিয়ে ডেরায় ফেরার, হেলতে দুলতে গাড়ির চাকা ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ করে এগোচ্ছে। বড়ো করুন, মর্মভেদী মুলকি দেহাতি গান। যেন বুকের গভীর থেকে দুঃখ–বেদনা ঝরে পড়ছে। যা চাপা থাকে সারাদিন কাজ আর ব্যস্ততায়।

রাত হলে, বেশি রাতে, যখন মানুষের বাড়ির বাইরে বার হওয়া, রাস্তায় যতায়াত, চলাচল কমে আসে। ফাঁকা রাস্তা ঠেলা ঠেলে নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফেরার পথে কানহাইয়ালাল, রামগুলাম–রা ঠেলা ঠেলতে ঠেলতে খুশিতে, আনন্দে গাইতে শুরু করল চৈতি, ফাগুয়া, বা কাজরী, পুরবী। বা রাস্তা, ফুটপাথে খাটিয়া পেতে, একদিকে উনুনে তরকারি চাপিয়ে, আটা মেখে ছেনে রুটি তৈরির ব্যবস্থা করছে, আরেকদিকে ঢোল নিয়ে খাটিয়াতে গোল হয়ে বসে পূরবী, কাজরী, বিরহা গাইতে শুরু করেছে। রাস্তায় যেতে–আসতে, আশেপাশের বাস বা দাঁড়িয়ে থাকা কেউ ওদের এই ভোজপুরীতে গাওয়া গান শুনে মুচকি হেসে, একটু চেঁচিয়ে বলল, বাহহো, বহুত বড়িয়া গানা, বা, জিও মেরে ইয়ার।

শ্রাবণের বিদায়ে, ভরা ভাদরে, প্রথম সপ্তাহ পার করে, ২৫ আগস্ট মধ্যরাতে, লালা লাজপত রায় সরণি, যা এলগিন রোড নামে পরিচিত, সেখানে বৈতানিকের ফাঁকা ঘাসহীন জমিতে পাতা বিছানো চেয়ারে বসে আছি। বৈতানিকের দু–তলা বাড়িটার প্রবেশ পথে, বারান্দায় শতরঞ্চি, চাদর বিছিয়ে ঢোল, তবলা, বাঁশির সাথে, নেপাল সীমান্তে অবস্থিত বিহারের সাহারসা জেলা থেকে আগত দলিত–মহাদলিত পরিবারের লোকগীতি শিল্পী সন্তোষ তুফানী, বীরেন্দার কুমার, কামাক্ষা প্রসাদ, ইন্দরজিৎ যাদবদের গাওয়া বিহারের লোকগীতি পূরবী, কাজরী, ফাগুয়া, চৈতি শুনতে শুনতে স্মৃতির সরণি বেয়ে পৌঁছে গেলাম সেই দিনগুলিতে। ভাবে বিহ্বল হয়ে স্মৃতির অতলে ডুব দিলাম। দলিত–মহাদলিত পরিবারের এই লোকগীতি শিল্পীদের গাওয়া গান শুনতে শুনতে মনে হল, বড়ো ভালো ছিলাম শৈশব–কৈশোরে, বড়ো ভালো ছিলাম বন্ধু–বান্ধব, সঙ্গীসাথি, পাড়া–প্রতিবেশীদের সাথে। মিলেমিশে, সুখে–দুঃখে, আপদে–বিপদে, দু–চোখে স্বপ্ন ছিল বড়ো হবার, মানুষের মত মানুষ হবার।

পৃথিবীতে কবিতার জন্ম দুঃখ থেকে হয় যদি, তাহলে সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে শ্রম থেকে। মাঠে, ক্ষেতে কাজ করতে করতে, পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করতে, কাজে উৎসাহ বাড়াতেই সৃষ্টি হয়েছিল সঙ্গীতের। ঋতুভিত্তিক কৃষিকাজ, গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে গ্রামীন মানুষের জীবনের সুখ, দুঃখ, ব্যাথা, বেদনা, চাওয়া–পাওয়া, আনন্দ, প্রেম, বিরহ মিলন নিয়ে লেখা ও সুরারোপিত এই লোকগীত শুনতে শুনতে এই উপলব্ধি হলো। জীবনের অনুভূতি যেন হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয়ে, গানের কথায় পরিণত হয়েছে, যে গানের কথা ও সুরে আছে মাটির গন্ধ ও ফসলের ঘ্রাণ। আছে দুঃখ, বেদনা, পার্থিব বঞ্চনার হাহাকার। এই আরাম, ভোগ, বিলাস, সুখের জীবন জমি, বাড়ি, ধন, সম্পত্তি, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র–কন্যা সব ছেড়ে চলে যেতে হবে একদিন। থেকে যাবে শুধু দেহের খাঁচায় বন্দী আছে যে আত্মা। অন্য কোনও শরীরে প্রবেশ করার জন্য। সহজিয়া জীবন ও দেহতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে লেখা কবীরের গানে ওদের লোকগীতের আসর শুরু, যে নির্গুণ ভজন শুনলেই মনে হবে, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ, খেয়াল, ধ্রুপদ–ধামার সৃষ্টি হয়েছে এই লোকসঙ্গীত থেকে। পরে যা মার্জিত হয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রূপে স্থান পেয়েছে রাজা, মহারাজা, নবাব–বাদশাহ–দের দরবারে। ভোজপুরীতে গাওয়া কবীরের এই নির্গুণ ভজনগুলি। কবীর নিজেও যে ভোজপুরী ভাষী ছিলেন। তাঁরই গান শোনা যাচ্ছিল —

'কড়ি জ্বালকর কয়লা ভয়ো, কয়লা জ্বালকর রাখ (ছাই) ভয়ো। কঙ্কর (পাথর) চুন চুন কর, মহল বানায়া, লোগ কহে ইয়ে মহল মেরা, ইয়ে মহল না মেরা, না তেরা, চিড়িয়া রহেন কা বসরা (বাসা)।'

তারপর রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিরহ মিলন নিয়ে গাথা কাজরী, পূরবী, হোলি নিয়ে ফাগুয়া, চৈতি ইত্যাদি গেয়ে শোনান সন্তোষ তুফানি, কামাক্ষা প্রসাদ, বীরেন্দার কুমার, ইন্দরজিৎ যাদবরা। ইন্দরজিৎ যাদবই এদের মধ্যে জাতে একটু উঁচু আহির (গোয়ালা) সম্প্রদায়ের। বাদবাকি সকলে মহাদলিত বা অতিশূদ্র। দশজনের এই দলে দু–একজন বাদে সকল গায়ক — – বাদক–ও। গাইতেও জানে, খোল করতাল ঢোল তবলা বাঁশি হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাজাতেও জানে। বয়সে সকলে তরুণ। পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। বড়োদের সাথে কোনও আখড়ায়, কারও বাড়ির দাওয়ায়, উঠোনে বসে বা উন্মুক্ত আকাশের নিচে মাদুর, শতরঞ্চি বিছিয়ে এদের গান শেখা, গানের চর্চা শুরু। সেখান থেকে গ্রামীন মণ্ডলীতে, গ্রামে–গঞ্জে গান গেয়ে শোনাতে শোনাতে এখন এরা নিজেদের জেলার বাইরে অন্য রাজ্যতে গান শোনাতে যায়। এখন বিহারে ভোজপুরীভাষী এইরকম দশ হাজার লোকসঙ্গীত শিল্পী তৈরি হয়েছে। বিহার সরকার ও বাংলা নাটক ডট কমের মতো সংস্থার উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায়। এদের মধ্যে মহিলা শিল্পী গাইয়েরা আছে। যদিও মহিলারা পুরুষদের সাথে একসাথে কোনও মঞ্চে বা আসরে বসে গান গায় না। এই গান গেয়ে শোনানো এখন তাদের পেশা হয়েছে। অর্থ উপার্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোজপুরী ছাড়া এরা মৈথিলীতে ভিখারী ঠাকুরের লেখা কিছু পূরবী–কাজরী গেয়ে শোনান, যা রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য রস, প্রেম বিরহ মিলন নিয়ে লেখা লোকগীত।

চা ... এ–ই–চা ...

জিতেন নন্দী, বজবজ, ৩১ আগস্ট •

প্রায় দু–বছর ধরে ভাবছি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলব। কিন্তু ওঁর ফুরসত কোথায়! শিয়ালদা স্টেশনে বজবজ লোকাল ঢোকে। আমরা হুড়মুড় করে কামরায় উঠে বসার জায়গা ম্যানেজ করি। যারা নিত্যযাত্রী এবং তাস খেলার প্লেয়ার, তারা পার্টনারদের জন্য জায়গা বুক করে নেয়। ইতিমধ্যে ঢুকে পড়ে চা ... এ–ই–চা ..., কাঁচি হাতে চানাচুর–কটকটি–ডালমুট–ঝুড়িভাজা, শণপাপড়ি কিংবা চিপস। আমি আর কিছু খাই না খাই, চা খাবই। লেবু চা — আগে ছিল এক টাকা, এখন একটু বড়ো সাইজের প্লাস্টিকের গ্লাসে দু–টাকা, সঙ্গে এক টাকাও চলছে। দু–চারবার কথা বলতে গেছি বটে। কিন্তু চা বিক্রেতার সময় একেবারে মাপা। কারণ লোকাল ট্রেন ছাড়ার সামান্য আগেই স্টেশনে আসে। মাঝের সময়টুকুতেই তাঁকে সবকটা বগি কভার করতে হয়।

শিয়ালদা স্টেশনের ভিতর চায়ের হকারির অনেকগুলো শ্রেণীভাগ এবং উপভাগ আছে। একদল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নির্দিষ্ট জায়গায় চা বিক্রি করে; একদল ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পর বগিতে উঠে বিক্রি করে; একদল ট্রেন ছাড়ার পর বগিতে বগিতে বিক্রি করে এবং একটা নির্দিষ্ট সীমা–স্টেশন পর্যন্ত চলে যায় ও ফিরে আসে। লোকাল এবং দূরপাল্লার ভাগ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে নর্থ সাউথ ভাগ, নর্থ সাউথের মধ্যে আবার বিভিন্ন লাইন যেমন বনগা বারাসাত ডানকুনি ক্যানিং লক্ষ্মীকান্তপুর বজবজ ইত্যাদি ভাগ। তার ওপরে আছে লেবু চা এবং দুধ চায়ের ভাগ।

আমার পরিচিত চাওয়ালা লোকাল ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পর বগিতে উঠে বিক্রি করেন। তবে সব লোকালে নয়, নির্দিষ্ট কিছু লোকালে এবং নির্দিষ্ট সময়ে।

গতকাল আমি আটটা পয়ঁত্রিশের লোকাল ধরব বলে এগোচ্ছি। দেখি একটা বড়ো পেটির ওপর তিনি বসে রয়েছেন। পরনে সেই নীল রঙের ইউনিফর্ম গোছের জামাপ্যান্ট। কী ব্যাপার? আমি কখনো ওঁকে বসে থাকতে দেখিনি। সবসময়ই একটা নির্দিষ্ট ছন্দে ছুটে চলতে দেখেছি। আজ কী হল?

ধনঞ্জয় মাইতির কথা

আমার বাড়ি হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার কমলপুরে। কাজের জন্য বারুইপুর লাইনে মল্লিকপুরে থাকি। হপ্তা হপ্তা বাড়ি যাই। ছেলেমেয়ে–বউ দেশে থাকে। মা–বাবা দুজনেই মারা গেছে। ত্রিশ বছর আগে শিয়ালদায় এসেছিলাম। আমি তখন এতটুকু বাচ্চা, স্টেশনের ওপারে একজন মহামেডানের মিষ্টির দোকানে কাজ করতাম। তারপর আস্তে আস্তে এখানে লাইন ধরলাম। বিয়ে–থা করলাম। চায়ের হকার দু–রকমের — রানিং আর স্টেশনের। আমরা প্রায় ২৩০–২৫০ জন স্টেশনে ট্রেনে উঠে চা বিক্রি করি। ডেলি পাঁচ–ছশো কাপ চা বিক্রি হয়। এক টাকা আর দু–টাকা মিলে। দু–টাকার হিসেবে ধরলে গড়ে তিনশো কাপ। চা নিজেই বানাই। কোলে মার্কেট থেকে লেবু কিনছি এখন তিনশো টাকা শ'। ভালো লেবু। আর চা পাতা চিনি তো আছেই।

প্রত্যেকদিন শিয়ালদায় এসে ভোর চারটে পয়ঁতাল্লিশের বজবজ লোকাল থেকে স্টার্ট করি। সকাল আটটা অবধি করে বাড়ি চলে যাই। ফের দুপুর তিনটে থেকে রাত ন–টা পর্যন্ত। আজ আমার চা শেষ হয়ে গেছে সাতটা নাগাদ। কম করে বানিয়েছিলাম। গরমের দিন। আজ আর বানাব না।

আমাদের লাইনে ফান্ড আছে। ফান্ড থেকে পুজোর সময় বোনাস দেওয়া হয়। আমাকে ডেলি পাঁচ টাকা করে দিতে হয়। প্রত্যেকের আলাদা কার্ড আছে। কার্ডে নাম, ঠিকানা, ছবি, ফোন নাম্বার সব আছে। ফান্ড আগে ছিল সিপিএমের, এখন তৃণমূলের। আবার যে আসবে, তার হবে। ওটা কিছু না।

ভ্যানরিক্সা চালকদের তারাতলা থানা ঘেরাও

বিজন কাহালি, বেহালা, ১২ সেপ্টেম্বর • ৩০ আগস্ট বেসব্রীজের সবজি বাজার হেমন্ত বসু মার্কেটের ভ্যানরিক্সা চালকরা তারাতলা থানা ঘেরাও করে। গত জুন মাস থেকে প্রতিদিন ভ্যান রিক্সা চালকরা তারাতলা থানার পুলিশ দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে। হেমন্ত বসু মার্কেটে ৩৫ বছর ধরে ভ্যানরিক্সা চালকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পুলিশের অত্যাচারের মাত্রা যখন চরমে ওঠে, পঞ্চাশটি রিক্সাভ্যান আটক করে পুলিশ নষ্ট করে দেয়, তখন ভ্যানরিক্সা চালকরা এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবীদের নেতৃত্বে তারাতলা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। শ্রী সহোদর ঘোষ, শ্রী বিমল দাস, শ্রী তপন মণ্ডল, ও শিক্ষক শ্রী সন্তোষ ওঝা এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং পরিষ্কার জানান, ভ্যানরিক্সা চালানো বন্ধ করা যাবে না। থানার সঙ্গে সমাজসেবীদের একটি আলোচনা হয়। থানা জানায়, সরকারের নিয়মমতো এখানে ভ্যানরিক্সা চালানো যাবে না এবং থানা থেকে একটা সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ভ্যান চালানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই সময়টা বাজারের পুরো ব্যবসায়িক পরিবহণ সময়। তাই ওই চারজন সমাজসেবীই জানান, হেমন্ত বসু মার্কেটের পরিবহণ ব্যবস্থার ৮০ ভাগ ভ্যানরিক্সার ওপর নির্ভরশীল। ভ্যানরিক্সা বন্ধ করে দিলে এই মার্কেটের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়বে। তাই ভ্যানরিক্সা চালানো বন্ধ করা যাবে না।

শেষ পর্যন্ত তারাতলা থানা সহানুভূতির সঙ্গে বলে, আপনারা ভ্যানরিক্সা চালান, আমরা কী ব্যবস্থা করতে পারি দেখছি।

বজবজ রোড বাড়াতে জিনজিরাবাজারে দোকান ভাঙার লিখিত হুমকি

অমিতা নন্দী, মহেশতলা, ৬ সেপ্টেম্বর • ব্রেসব্রীজের কাছে জিনজিরাবাজারে যে অংশ বজবজ রোডের বাঁদিকে ছিল, সেখানকার দোকানিরা মহেশতলার পুরসভার চেয়ারম্যানের মৌখিক নির্দেশে রাস্তার উল্টোদিকে অন্য একটি কারখানার লিজ নেওয়া জমিতে গেট ভেঙে ঢুকে পড়ে বছরখানেক আগে। বজবজ রোড সম্প্রসারণের জন্য নাকি এটা দরকার ছিল, অর্থাৎ সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গিয়ে বেসরকারি জমি দখল করা হল। যে কোম্পানি ওই জমি লিজ নিয়েছিল পনেরো বছরের জন্য, তারা সংশ্লিষ্ট থানায় এফআইআর করে।

পুরসভার চেয়ারম্যান ওই বাজারের ব্যবসায়ীদের মৌখিক ভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন, যে তাদের উনি দেখবেন। বেশিরভাগ দোকানি পুরোনো জায়গা ছেড়ে গেলেও মুষ্টিমেয় চার–পাঁচটি দোকানের ব্যবসায়ীরা জায়গা ছাড়েননি। তাঁরা উপযুক্ত লিখিত নোটিশ দেখতে চেয়েছিলেন। এবং সঠিক ও আইনি পুনর্বাসনের দাবি করেছিলেন। এতদিন তাদের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা ও হুমকি দেওয়া চলছিল। তারা বজবজ রোড (জিনজিরা–আছিপুর) ব্যবসায়ী উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে হাইকোর্টে মামলা করেন এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে। গত জুলাই মাস থেকে হাইকোর্টে শুনানি আরম্ভ হয়।

হাইকোর্টে চিফ জাস্টিস সরকারপক্ষের কাছে সমস্ত ডকুমেন্ট দেখতে চান। এতদিনেও তারা কোনও সাড়া দেননি। উপরন্তু মামলা চলাকালীন সম্প্রতি হঠাৎ একটি নোটিশ জারি করে মহেশতলা পুরসভার পক্ষ থেকে ওই চারটি দোকানে আঠা দিয়ে ওই নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হয় (ছবি দ্রষ্টব্য)। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে আবার একটি শুনানির দিন ছিল। সেদিনও চিফ জাস্টিস আবার পনেরো দিনের সময় দেন দু'পক্ষকেই নিজেদের ডকুমেন্ট পেশ করার জন্য। ব্যবসায়ীদের বলেছেন, তাদের ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি দেখাতে। আর বলেছেন, মহেশতলা বা অন্য কোনও পুরসভার এক্তিয়ার নেই এমন কোনও নোটিশ ঝোলানোর। প্রথমত এটি একটি বিচারাধীন বিষয়। দ্বিতীয়ত, সরকারি জমি থেকে এভিকশন বা উচ্ছেদের অধিকার পুরসভার চেয়ারম্যানের নেই। তা করতে পারে পিডব্লুডি বা বিএলএল এলআরও, বলেছেন ব্যবসায়ী পক্ষের উকিল।

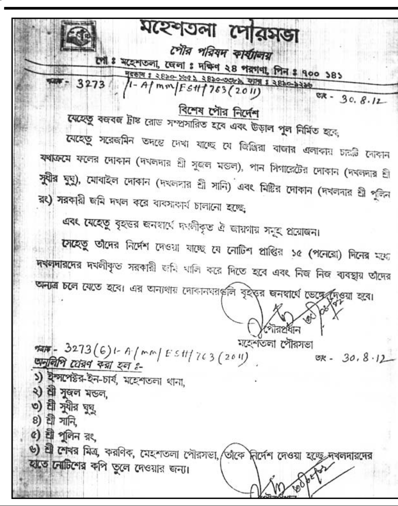
মহেশতলা পৌরসভা
পৌর পরিষদ কার্য্যালয়
পোঃ মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন : ৭০০ ১৪১
স্মারক - 3273 /1-A/mm/ESH/763(2011) তং - 30.8.12
বিশেষ পৌর নির্দেশ
যেহেতু বজবজ ট্রাঙ্ক রোড সম্প্রসারিত হবে এবং উড়াল পুল নির্মিত হবে,
যেহেতু সরেজমিন তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে জিঞ্জিরা বাজার এলাকায় চারটি দোকান যথাক্রমে ফলের দোকান (দখলদার শ্রী সুজল মন্ডল), পান সিগারেটের দোকান (দখলদার শ্রী সুধীর ঘুঘু), মোবাইল দোকান (দখলদার শ্রী সানি) এবং মিষ্টির দোকান (দখলদার শ্রী পুলিন রং) সরকারী জমি দখল করে ব্যবসাকার্য চালানো হচ্ছে,
এবং যেহেতু বৃহত্তর জনস্বার্থে দখলীকৃত ঐ জায়গায় সমূহ প্রয়োজন।
সেহেতু তাঁদের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে দখলদারদের দখলীকৃত সরকারী জমি খালি করে দিতে হবে এবং নিজ নিজ ব্যবস্থায় তাঁদের অন্যত্র চলে যেতে হবে। এর অন্যথায় দোকানঘরগুলি বৃহত্তর জনস্বার্থে ভেঙ্গে দেওয়া হবে।
পৌরপ্রধান
মহেশতলা পৌরসভা
স্মারক - 3273(6)/1-A/mm/ESH/763(2011) তং - 30.8.12
অনুলিপি প্রেরণ করা হল :-
১) ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ, মহেশতলা থানা,
২) শ্রী সুজল মন্ডল,
৩) শ্রী সুধীর ঘুঘু,
৪) শ্রী সানি,
৫) শ্রী পুলিন রং,
৬) শ্রী শেখর মিত্র, করণিক, মহেশতলা পৌরসভা, তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে দখলদারদের ঘরে নোটিশের কপি তুলে দেওয়ার জন্য।

প্রথম পাতার পর

নর্মদা নদীর তীরে আন্দোলন

ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর পিপলস মুভমেন্ট একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ২০১১ সালের মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দিয়ে বলে, জমির বদলে জমি দিতে হবে বাঁধের কারণে উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের, এবং জমির ন্যূনতম পরিমাণ হবে ২ একর। কিন্তু একবছর পার হয়ে গেলেও ২৫০০ জমিহারা পরিবার কিচ্ছু পায়নি। অন্তত ১০০০ পরিবার, যাদের ঘর গেছে, তারা ঘরের জায়গাও পায়নি।

১০ সেপ্টেম্বর ১৭ দিন এই সত্যাগ্রহ চলার পর মধ্যপ্রদেশ সরকার ঘোষণা করে, ওঙ্কারশ্বের বাঁধের জলস্তর ১৮৯ মিটার থেকে আর বাড়ানো হবে না। এবং উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের 'জমির বদলে জমি' নীতিতে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। বাঁধের জল বাড়তে বাড়তে তখন সত্যাগ্রহীদের নাক অবধি পৌঁছে গেছে। সরকারের এই ঘোষণার পর ঘোঘোলগাঁও–এর জল–সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা হয়।

কিন্তু মধ্যপ্রদেশেরর আরেকটি অঞ্চল হরদা–তে ইন্দিরা সাগর বাঁধের উচ্চতা ২৬০ মিটার থেকে বাড়িয়ে ২৬২ মিটার করার বিরুদ্ধে জল–সত্যাগ্রহ তখনও চলতে থাকে। ৪ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা সাগর বাঁধের জল–সত্যাগ্রহ শুরু হয় খারদানা, বাদখালিয়া এবং বাদগাঁও মাল গ্রামে। কয়েকশ' মানুষ সামিল হয় এই সত্যাগ্রহে। ১২ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশ সরকার এই সমস্ত গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করে। প্রায় ১২০০ পুলিশ পাঠিয়ে জোর করে জল–সত্যাগ্রহ ভেঙে দেওয়া হয়। ২৪৫ জনকে গ্রেফতার করা হয় সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার কারণে।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালেও নর্মদা নদীর ওপর বাঁধের জলস্তরের উচ্চতা বাড়ানোর বিরুদ্ধে জলসত্যাগ্রহ সংগঠিত হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের গুনজারি, জুনাপানি এবং করনপুরা গ্রামে।

পত্রিকার পাতা থেকে

কোম্পানি কারখানা গেটকে দুর্গে পরিণত করল

মারুতি সুজুকি মানেসর ডায়েরি (৪)

শের সিং সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার' থেকে • ২৮ আগস্ট ২০১১ ছিল রবিবার, কারখানার ছুটির দিন। ছুটছাট কিছু কাজের জন্য কোম্পানি দেড়–দুশো শ্রমিককে কারখানায় ডিউটি দিত ছুটির দিনে। এটা ওভারটাইম, অথচ খাতায়–কলমে দেখানো হত না। এইদিন দুপুরের পর স্টাফেরা আসতে শুরু করল। রাত আটটার সময় ক্যাম্প খাটানোর সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে চার–পাঁচশো পুলিশ ফ্যাকট্রির ভিতরে ঢুকল। রাত সাড়ে আটটার সময় সুপারভাইজররা কাজ থেকে ওই দেড়–দুশো শ্রমিককে তুলে নিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। পরদিন ২৯ আগস্ট এ–শিফটের শ্রমিকেরা গেটের কাছে পৌঁছে দেখল, কোম্পানি কারখানার গেটকে দুর্গে পরিণত করেছে। সাধারণত গেটে গ্রুপ–ফোর গার্ডেরা থাকে। এদিন তাদের সঙ্গে গেটের বাইরে তৈরি ছিল ৫০–৬০ জন পুলিশ। ফ্যাকট্রির ভিতরে টেপ রেকর্ডার বাজছিল : 'স্থায়ী শ্রমিক এবং ট্রেনিরা গুড কন্ডাক্ট বন্ডে সই করে ভিতরে যাও। ঠিকেদারের আন্ডারে যারা আছো, নিজের নিজের ঠিকেদারের সঙ্গে দেখা করো। অ্যাপ্রেন্টিসদের তিনদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে ...' গেটের বাইরে নোটিশ লটকানো ছিল — তাতে ছিল বরখাস্ত পাঁচ স্থায়ী শ্রমিকের নাম, ট্রেনিং সমাপ্ত অর্থাৎ বরখাস্ত ৬ ট্রেনির নাম, সাসপেন্ড ১০ স্থায়ী শ্রমিকের নাম। সমস্ত শ্রমিক গেটের বাইরেই থাকল। বি ও সি শিফটেও একই পরিস্থিতি বহাল থাকল।

এদিকে ২৯ তারিখ আশপাশের গ্রামে যেসব ঠিকেদার থাকে, তারা ঠিকা শ্রমিকদের শাসাতে লাগল, ধাক্কাধাক্কি করে হুমকি দিল, 'খবরদার মারুতি–সুজুকি ফ্যাকট্রির গেটে যাবি না'। কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকেরাও গ্রামে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে থাকল।

৩০ আগস্ট ফ্যাকট্রিতে টেপ বাজতে থাকল। নতুন করে ১২ জন ট্রেনিকে ছাঁটাই করা হল। আরও ১৬ জন স্থায়ী শ্রমিককে সাসপেন্ড করা হল।

৩১ আগস্ট গেটের কাছাকাছি শ্রমিকেরা জড়ো হল। নেতারা বক্তৃতা দিতে থাকল। গান–টানও চলল। শ্রমিকেরা ১২ ঘণ্টা করে বদলি হাজিরা দিয়ে দিনরাত অবস্থান চালাতে শুরু করল। ১ সেপ্টেম্বর এই অবস্থানে এল বহু সংগঠনের নেতা — মারুতি–সুজুকি গুরগাঁও ফ্যাকট্রি, সুজুকি পাওয়ারটন, নেপিনো অটো, রিকো, ওমেক্স, লুমেক্স, হিরো হন্ডা, সোনা স্টিয়ারিং ইত্যাদি কারখানার সাধারণ শ্রমিকদের পাশাপাশি জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমেত পাঁচ হাজার মানুষ জমায়েত হল। এবার পত্রপত্রিকার লোকেরাও আসতে শুরু করল। ফ্যাকট্রির টেপ রেকর্ডারে নতুন সুর শোনা গেল : ৫ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপ্রেন্টিসরা কাজে যোগ দাও।

৫ সেপ্টেম্বর ফ্যাকট্রি থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে–৮ পর্যন্ত শ্রমিকদের দর্শনীয় মিছিল হল। *চলবে*

নিয়মকানুন মেনে কাগজপত্র রেখে গ্যাসের গাড়ি চালিয়েও কেস খাচ্ছি

কাজল দাস, রবীন্দ্রনগর, মহেশতলা, ৬ সেপ্টেম্বর • আমি এক সপ্তাহ আগে একটি চিঠি পাই লালবাজার থেকে। চিঠিটাতে লেখা ছিল, আমি নাকি কিরণ শঙ্কর রায় রোডে সকাল ন–টা নাগাদ 'নো রাইট টার্ন' মানিনি এবং এর জন্য আমার একটা ফাইন হয় একশো টাকার। আমার গাড়ির নম্বর ডব্লু বি ০৪এফ ০৯২৬। আমার মনে হচ্ছে, যে এলাকায় ওঁরা কেস দিয়েছেন, সেই এলাকায় আদৌ অটো চলে কিনা আমার জানা নেই। আমি ওখানে জীবনে কোনোদিন যাইনি, যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। আমি যদি লালবাজারে যেতাম, পাঁচ–ছদিন আমাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হত। সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। বাধ্য হয়ে ইউবিআই–এর মেটিয়াব্রুজ শাখায় গিয়ে আমাকে একশো টাকা জমা দিতে হয়েছে। এই ধরনের কেস আমাদের রুটে আরও তিন–চারটে হয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, একটি গাড়ি চুরি হয়ে গেছে আজ থেকে ন–মাস আগে। তা সত্ত্বেও সেই অটোর চালক শেখর দাস (গাড়ির নম্বর ডব্লু বি ০৪এফ ১৪৫১) এক মাস আগে চিঠি পায়, সে একটি জায়গায় সিগনাল মানেনি। তার জন্য সে একটি কেস খায়। অথচ তার গাড়ি চুরি হয়ে গেছে ন–মাস আগে। এই ধরনের কেস কীভাবে হচ্ছে, আমার মাথায় আসছে না। এইভাবে কতদিন আমরা প্রশাসনের চাপ সহ্য করব?

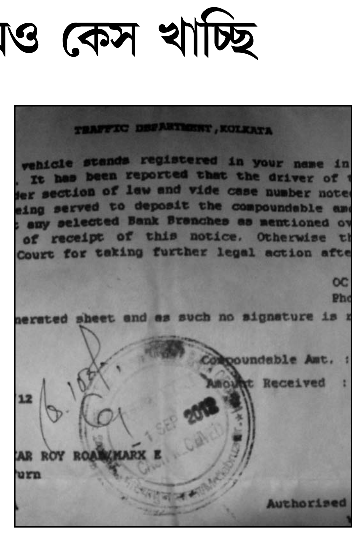
TRAFFIC DEPARTMENT, KOLKATA
vehicle stands registered in your name in
. It has been reported that the driver of
der section of law and vide case number note
eing served to deposit the compoundable am
any selected Bank Branches as mentioned o
of receipt of this notice. Otherwise t
Court for taking further legal action afte
OC
Pho
nerated sheet and as such no signature is
Compoundable Amt.
Amount Received
AR ROY ROAD/MARX E
urn
Authorised

এছাড়া আমাদের রুটের অনেকে গাড়ির পারমিটের জন্য টাকাপয়সা জমা দিয়েছে জানুয়ারি মাসে। এখনও সরকার আমাদের পারমিট দিচ্ছে না। কবে দেবে তাও ঠিক নেই। দিনের পর দিন আমরা পারমিটের জন্য মোটর ভেহিকেলসে গিয়ে হন্যে হয়ে ফিরে আসছি। চেয়ারম্যান মি. বাগচীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, কবে হবে বলতে পারছি না, এটা মন্ত্রীমশাইয়ের ব্যাপার। আমরা চাই, এই পারমিট আর কেসের ব্যাপারে একটা সমাধান হোক। আমাদের এই রুটে অটোয় পুলিশ আমাদের চারজন করে নিতে বলছে। কিন্তু আমাদের এখানে এখনও অনেক পেট্রল গাড়ি, কাটা তেলের গাড়ি এবং ডিজেল গাড়ি কোনো পারমিট বা কাগজ ছাড়াই অনবরত চলছে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে। এমনকী দশ–পনেরোজন যাত্রী নিয়ে। অথচ আমরা সমস্ত নিয়মকানুন মেনে কাগজপত্র রেখে গ্যাসের গাড়ি চালিয়েও কেস খাচ্ছি। এর আমরা সমাধান চাই।

আমাদের তিনটে ভাগে ইউনিয়ন আছে — সিটু, আইএনটিটিইউসি এবং ওনার অ্যাসোসিয়েশন। তিনটে সংগঠনের ওপরমহলে আমরা জানিয়েছি। তারা বলছে, এখন কিছুই করা যাবে না। নেতাদের সঙ্গে আমরা এই নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছি। তারা এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ।

প্রথম পাতার পর

কুডানকুলামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, আন্দোলন অটুট

এদিকে সমুদ্রের ধারে একদল পুলিশ যখন এই ঘটনা ঘটাচ্ছিল, তখন আরেক দল আন্দোলনকারীরা যেসব গাড়িতে করে এসেছিল, সেগুলো ভাঙতে থাকে। সেটা ভিডিওতে তুলছিল টাইমস নাউ পত্রিকার এক সাংবাদিক। পুলিশ তাকে বেধরক মারে, তার ভ্রুর ওপরে চারটে সেলাই দিতে হয়েছে। তার ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলা হয় ও সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, এবং ভিডিও টেপটি নষ্ট করে ফেলা হয় বলে জানা গেছে। শোনা যাচ্ছে, মিডিয়ার লোকের ব্যবহার করা তিনটে মোটরসাইকেল পুলিশি আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দিনাকরণ পত্রিকার এক সাংবাদিককে ধাক্কা দেওয়া হয়, এবং মাক্কাল টিভির এক সাংবাদিককে ঝোপে ফেলে দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারীদের পেটানোর সাথে সাথে পুলিশ সমুদ্রের তীরে দাঁড় করানো বোটগুলির দামী মেশিনগুলি ভেঙে ফেলতে থাকে। একজন কনস্টেবল আন্দোলনকারীদের ম্যারাপে আগুন দিতে যায়। কিন্তু একজন ক্যামেরাধারী সেটা তুলছে দেখে পিছিয়ে আসে। ওই ক্যামেরাধারী তখন পুথিয়া থালাইমুরাই–এর সাংবাদিক রামানুজন–কে ঘটনাটা বলে। ওই কনস্টেবল আরেকবার চেষ্টা করে আগুন দেওয়ার, কিন্তু বিফল হয়ে ক্যামেরাধারীকে বলে যায়, সে তার কাজে বাধা দিচ্ছে। ম্যারাপটি ভেঙে ফেলা হয়। লাইট এবং মাইক্রোফোন ভেঙে ফেলা হয়। আন্দোলনকারীদের দুপুরের খাবারের জন্য তৈরি করা রান্নাবান্নায় বালি দেওয়া হয়।

সমুদ্রের ধারে যখন একদল পুলিশ এই তাণ্ডব চালাচ্ছে, তখন আরেকদল পুলিশ, সংখ্যায় প্রায় চারশ', ইদিনথাকারাই গ্রামে ঢোকে। মিডিয়া তখন সমুদ্রের ধারে ব্যস্ত, তারা পুলিশের সাথে ওই গ্রামে যায়নি। পুলিশ গ্রামে ঘরে ঘরে ঢুকে ছেলেদের খোঁজ করতে শুরু করে। গ্রামের শেষপ্রান্তে পৌঁছে তারা দেখে, প্রায় দেড়শ–দুশো যুবকের জটলা। পুলিশ দেখে ওই যুবকেরা সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে এবং শাসাতে থাকে, পাড়ে এলে তাদের অবস্থা খারাপ হবে।

পুলিশ এরপর চার্চে ঢোকে, লুরদ্র মাথা দেবতার মূর্তি ভাঙে। পুলিশের লোকেরা চার্চে থুতু ফেলতে থাকে এবং পেচ্ছাপ করতে শুরু করে। চার্চের সামনে গড়ে তোলা ম্যারাপ টেনে নামায় এবং লাইট ভাঙচুর করে। জলের পাত্র ভেঙে ফেলে। কুডানকুলামের সরকারি জল সরবরাহ পাত্রটিও ভেঙে ফেলা হয় বলে খবর।

যেসব মহিলারা ঘরের আড়াল থেকে ঘটনাটা দেখছিল, তারা জানায়, কিছু অচেনা পুরুষ, ধুতি পরা, তারা পুলিশের গাড়িতে ঢিল ছুঁড়ছিল এবং পুলিশের লোক তার ভিডিও করছিল।

সংবাদে দেখানো হতে থাকে, কুডানকুলামের সরকারি মদের দোকান এবং পঞ্চায়েত অফিস আগুন লাগানো হয়েছে। করেছে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা জানায়, মোটেই আগুন দেওয়া হয়নি। মদের দোকানের অ্যাসবেসটসের কিছু অংশ ভাঙচুর করা হয়েছে, একথা ঠিক। কিন্তু কোথাও আগুন লাগানো হয়নি। পরে সন্ধ্যেবেলা কুডানকুলাম থেকে প্রায় ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার আগে দুপুরবেলা সেখানে ঘরঘর তল্লাসী চালানো হয়। সন্ধ্যেবেলায় ইদিনথাকারাই–এর সুনামি কলোনি–তে ঢুকে পুলিশ ঘর ঘর তল্লাসী চালায় এবং কিছু ভাঙচুরও চালায় বলে অভিযোগ। রাতে অন্তত পাঁচটি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তার সাথে সবার মোবাইল ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে, উদয়কুমার কোথায় লুকিয়ে আছে তা জানার জন্য।

এই পুলিশি দমনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই আগুনের মতো প্রতিবাদও ছড়িয়ে পড়ে গোটা দক্ষিণ তামিলনাড়ুর উপকূল অঞ্চলের মৎস্যজীবী গ্রামগুলিতে। থুথুকুড়ির মানাপাড় গ্রামের মৎস্যজীবী অ্যান্থনি স্যামি (৪০) গুলিতে মারা যায়। প্রচুর মানুষ থুথুকুড়ি স্টেশনে রেল অবরোধ করে, যার জেরে মাইশোর এক্সপ্রেস দু'ঘন্টা আটকে পড়ে।

তামিলনাড়ুতে অন্ত্যজ অংশের প্রতিবাদকে হিংস্রভাবে দমন করার ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৯৯ সালে ১৭ জন দলিত চা শ্রমিককে তাড়া করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল পুলিশ, তিরুনেলভেলিতে। এক বছর আগে পালামাকুড়িতে দলিতরা তাদের নেতা ইমানুয়েল শেকরণকে সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলে, পুলিশ তাদের তাড়া করে এবং গুলি চালিয়ে ৬ জনকে মেরে ফেলে এবং ৩০ জনেরও বেশি আহত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর শোনা যায়, ওই দিন নেতাদের খোঁজে ইদিনথাকারাই গ্রাম আক্রমণ হবে। ইদিনথাকারাই গ্রামকে বাঁচানোর জন্য উদয়কুমার সহ অন্যান্য নেতারা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা রাজি হয়নি। এক আবেগপূর্ণ, দীর্ঘকালব্যাপী চলা সভায় ইদিনথাকারাই–এর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা আগে সবাই গ্রেফতার হবে, তারপর তাদের নেতারা গ্রেফতার হবে।

১৩ সেপ্টেম্বর ইদিনথাকারাই ও কুডানকুলামের কয়েক হাজার গ্রামবাসী প্রকল্পের সামনে সমুদ্রের জলে নেমে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে জল সত্যাগ্রহ পালন করে। এই সত্যাগ্রহ চলার সময় এলাকার মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিতে থাকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কপ্টার।

১০ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সারা দেশজুড়ে কুডানকুলামের আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভ শুরু হয়। ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের সামনে পোস্টার, স্লোগান সহ বিক্ষোভ সংগঠিত হয় বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত। বিক্ষোভ হয় দিল্লী, ত্রিভান্দ্রাম, পুনে সহ বেশ কিছু শহরে। ১৩ সেপ্টেম্বর সারা দেশের অনেকগুলি শহরে একসাথে বিক্ষোভ হয় সন্ধ্যেবেলা। কলকাতায় একশ'র বেশি মানুষ মোমবাতি নিয়ে মিছিল সংগঠিত করে। নিচে কুডানকুলামের ছবি।

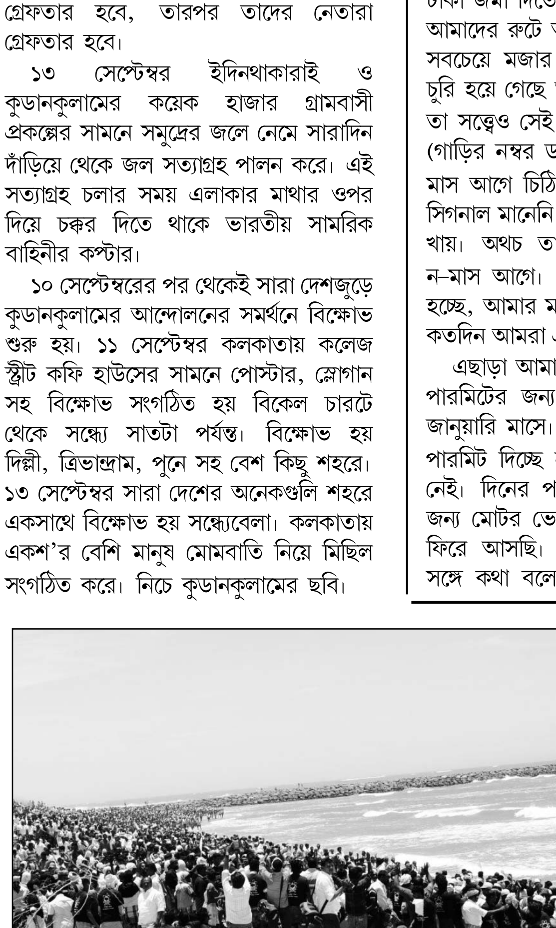

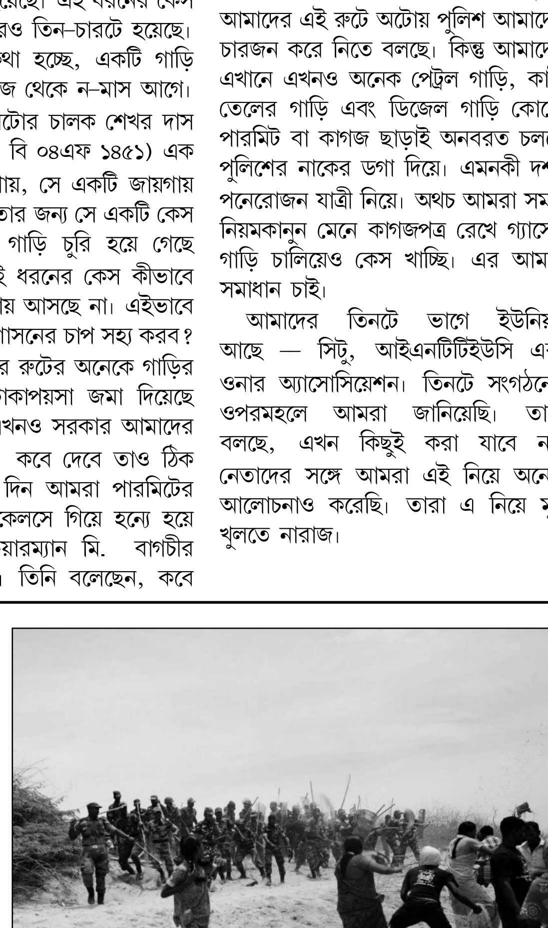

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

তলিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ামারা দ্বীপ

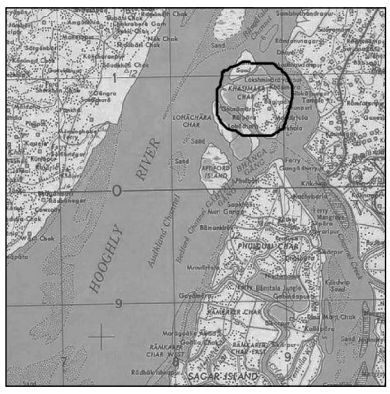

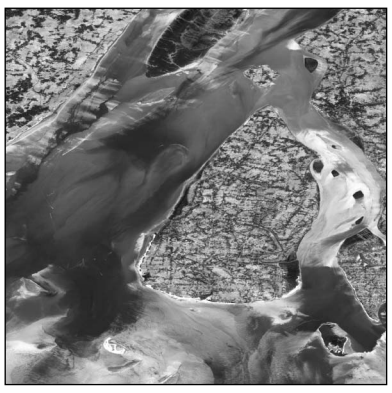

(ওপরে) এই বাম দিকের ছবিটা ১৯৫৪ তে আমিরিকান আর্মি ম্যাপ আর ডান দিকে ২৭ শে সেপ্টেম্বর,২০০৬ এ নাসার আর্থ অবসারভেটরি থেকে নেওয়া। (নিচে) ঘোড়ামারা দ্বীপের ভাঙনের এখনকার ছবি। ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে এই পানের বরজের কাচ দিয়ে ছিল রিং বাঁধ, আর ওই জাহাজের কাছে ছিল পাড়। দোকানটা ছিল এই ছেলেদুটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে। পাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ গেলেও পার ভাঙে, এমনই মত বিশেষজ্ঞদের। ছবি পার্থ কয়াল।

পার্থ কয়াল, ঘোড়ামারা, ১৯ আগস্ট •

কোলকাতা থেকে নামখানার ট্রেন ধরে কাকদ্বীপ হয়ে লট নং ৮ হয়ে ঘোড়ামারা যাওয়ার ট্রলার ধরলে সর্বসাকুল্যে ঘন্টা পাঁচেক সময় লাগে। ২০০৯–এর আগষ্টে ওখানে গিয়ে যে জায়গায় ট্রলার থেকে নেমেছিলাম এখন সেটা নদী ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে। সেখানে একটি চা–দোকান, যা প্রতি বছর নদী ভাঙনের সাথে সাথে ঠাঁই বদলায়। দোকানীর জায়গা জমিও চলে গেছে নদী গর্ভে। প্রতিবার নদী একটু একটু করে ভাঙে আর তার সাথে তাল মেলানোর চেষ্টা করে দিশাহারা মানুষ। একসময় এই দ্বীপের আয়তন ছিল ৩৪০০০ একর। এখন ধরলে সর্বসাকুল্যে ১৫০০ বিঘাও হবে না,বললেন এখানেরই একবাসিন্দা। একটু অবাক হয়েই যাই প্রতিবার যখন দেখি ভাঙনের ভয় নিয়ে এরা ঘর সংসার চালায় কী করে। রহস্যটা কী? যার চা–দোকান তার সন্তান খেলছিল সামনে। ওনার স্বামী মাঠে, পান বরজে কাজ করেন। আপনার চলে কী করে? জমি আগাম নিয়ে আমন চাষ করেননি? মলিন মুখে বললেন — না, আমাদের বি পি এল কার্ডের চালগম পেয়ে আর কিছু কিনে চলে। কতটা চাল–গম পান? সাড়ে তিন কেজি সপ্তাহে। আপনারা তিনজনে কটা কার্ড? দুটো। তার মানে সাত কেজি মাল পান। না, এক কেজি চাল আর এক প্যাকেট আটা কার্ড পিছু। অনেকে এই চাল খায় না, আমরা খাই। সবাই তো ওপারে (এখানে কাকদ্বীপ) জায়গা–জমি কিনে চলে যাচ্ছে, আপনারা যাবেন না? না জায়গা–জমির প্রচুর দাম (গঙ্গাসাগরের বাস স্ট্যান্ডের কাছে জীবনতলা কলোনী গড়ে ওঠা এই ঘোড়ামারা আর পূর্বতন লোহাচরা দ্বীপ,যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,সেই সব মানুষদের পুনর্বাসন দিয়েছে)।

ট্রলারে করে যখন লট নং ৮ থেকে ঘোড়ামারায় আসছি তখন আলাপ হল দিব্যেন্দু প্রামাণিকের সাথে। কাছেই ঘর,মন্দিরতলার কাছে। সদ্য গোঁফের রেখা বেরিয়েছে। তিনবছর আগে ক্লাস সিক্সে পড়া শেষ করে কাজের সন্ধানে প্রথমে চেন্নাই যায় ওর কিছু বন্ধুদের সাথে। সেখানে শেল্টারিং–এর কাজে জোগাড়ে হিসেবে কাজ শুরু করে। কন্ট্রাক্টরের সাথে কথা হয় কাজ শিখে গেলে রোজ ১৬০ টাকা থেকে বেড়ে ২০০ টাকা হবে। কিন্তু তিনমাস পর দেখা গেল, দিচ্ছি দেব করেও আর ওই টাকা দিচ্ছে না। তখন ওরা কাজ ছেড়ে দেয়। এর পর থেকে গুজরাটে জাহাজ মেন্টেন্যান্সের কারখানায় যোগ দেয়। ওখানে এদিকের আরো ছেলে আছে। নামখানা,কাকদ্বীপের ছেলেরাও কাজ করে। ৩০০ টাকা রোজ। এই আশ্বিন মাসের ৩ তারিখে যাবে। *চলবে*

খ ব রে দু নি য়া

মিডিয়ায় মুসলিম বিরোধী ব্যঙ্গ সিনেমা, দেশে দেশে মার্কিন দূতাবাসে বিক্ষোভ

কুশল বসু, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর, এএফপি–র তোলা ছবিতে কায়রোয় মার্কিন দূতাবাসে বিক্ষোভ •

পয়গম্বর মহম্মদ–কে নিয়ে ফের একটি মার্কিন ব্যঙ্গ চলচ্চিত্রের কারণে আরব দুনিয়ায় মার্কিন দূতাবাসগুলিতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। মিশর, লিবিয়া বা ইয়েমেনের মতো দেশগুলিতে এই বিক্ষোভকারীরা সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও তাদের মারমুখী মেজাজ এবং মার্কিন দূতাবাসে হামলার কারণে তা দেশ–বিদেশের মিডিয়ার মূল খবরে পরিণত হয়েছে।

২০১১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডে বানানো চলচ্চিত্র 'ইনোসেন্স অফ মুসলিমস' এবছর জুন মাসে প্রকাশ পেলেও তা খুব একটা চলেনি। জুলাই মাসে ইন্টারনেটের ভিডিও প্রচার করার ওয়েবসাইট ইউটিউবে ওই সিনেমাটির একটি ট্রেলার বা সংক্ষিপ্ত অংশ তুলে দেন এক ব্যক্তি, নিজেকে স্যাম বাসিল, এবং মার্কিন–ইজরায়েলি বলে পরিচয় দিয়ে (যদিও এই নামে কোনও ব্যক্তি নেই বলে জানিয়েছে মার্কিন এবং ইজরায়েলি কর্মকর্তারা)। ৪ সেপ্টেম্বর ওই একই ব্যক্তি ট্রেলারটি আরবি ভাষায় 'ডাব' করিয়ে ইউটিউবে তুলে দেন। মিশরে এই আরবি অনুবাদটি বড়ো মিডিয়ার নজরে আসে এবং তাদের মধ্যে গোঁড়া মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক চ্যানেল এবং অনুষ্ঠানগুলো এই ভিডিওটি সম্প্রচার করতে শুরু করে। যেমন খালেদ আবদাল্লা বলে একজন ৮ সেপ্টেম্বর এটি সম্প্রচার করে একটি চ্যানেলে। পরে জানা যায়, মুসলিম বিদ্বেষী মার্কিন নাগরিকরাও, যেমন টেরি জোনস (যিনি ফ্লোরিডাতে মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান প্রকাশ্যে পুড়িয়েছিলেন এবং যার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা হয়েছিল ২০১০ সালে), এই ভিডিওটি আমেরিকায় দেখানোর পরিকল্পনা করেছিল এবছর ১১ সেপ্টেম্বর। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন মুলুকে এতাবৎ কালের সবচেয়ে বড়ো সন্ত্রাসী হামলা ঘটেছিল। যার অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলি এখনও সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছে আফগানিস্তান এবং ইরাকে।

এই সিনেমাটির প্রতিবাদে এবং সিনেমাটির সম্প্রচার বন্ধ করার দাবি নিয়ে ১১ সেপ্টেম্বর মিশরের রাজধানী কায়রোর মার্কিন দূতাবাসে প্রথম বিক্ষোভ দেখায় প্রায় ৩০০০ মিশরীয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দূতাবাসের দেওয়ালে উঠে মার্কিন পতাকাটি টেনে নামিয়ে একটি কালো পতাকা তুলে দেয় সেখানে। মিশরীয় পুলিশ কোনও বলপ্রয়োগ না করে এই বিক্ষোভকারীদের দূতাবাসের বাইরে বের করে দিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু ওই ১১ সেপ্টেম্বরই লিবিয়াতে মার্কিন দূতাবাসের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। এমনিতেই ২০১১ সালে লিবিয়ায় গদ্দাফি জমানার শেষ হওয়ার পর থেকেই লিবিয়া জুড়ে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে। গদ্দাফিকে মেরে ক্ষমতায় আসা বর্তমান মার্কিন মদতপুষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালাচ্ছে কিছু গোষ্ঠী। ১১ সেপ্টেম্বর রাতে বেশ কিছু বন্দুকধারী ব্যক্তি লিবিয়ার বেনঘাজি শহরের মার্কিন দূতাবাসে ঢুকে পড়ে এবং আক্রমণ চালায়। দূতাবাসের সুরক্ষাকারী লিবিয়ান এবং মার্কিন সেনা ও আক্রমণকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত দশজন আক্রমণকারী এবং চারজন মার্কিন দূতাবাস কর্মী (যাদের মধ্যে আছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার স্টিভেন) মারা যায়। লিবিয়া সরকারের এক মন্ত্রী ১৩ সেপ্টেম্বর জানান, এই আক্রমণের সঙ্গে ওই সিনেমার কোনও সম্পর্ক নেই। এটি পূর্বপরিকল্পিত। উল্লেখ্য, এবছরের জুন মাসেও লিবিয়াতে এক ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ওপর রকেট হামলা হয়েছিল, যদিও কোনও প্রাণহানি হয়নি।

১৩ সেপ্টেম্বর ইয়েমেনের রাজধানী সানা–তে মার্কিন দূতাবাসে হিংসাত্মক বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা রক্ষীদের সংঘর্ষে অন্তত চারজন মারা যায়। উল্লেখ্য, ইয়েমেনে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষ চলছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে।

এছাড়াও ইরান, ইজরায়েল, ইরাক, তিউনিশিয়া প্রভৃতি দেশে কিছু ছোটো ছোটো বিক্ষোভ এবং মার্কিন পতাকা পোড়ানোর ঘটনা ঘটে সিনেমাটি সম্প্রচার বন্ধ এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি তুলে।

জঙ্গলমহলের বেলিয়া গ্রামে শিক্ষক দিবস পালন

অলোক দত্ত, বেলিয়া, ঝাড়গ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর •

১৯৮০ সালে প্রয়াত হয়েছেন এই অঞ্চলের তৎকালীন আদর্শ শিক্ষক মানিক চন্দ্র পাল। তাঁর একটা ছবিও উদ্যোক্তারা জোগাড় করতে পারেননি, হাজার চেষ্টা করেও। তবু তাঁকে স্মরণ করেই ঝাড়গ্রাম শহর থেকে কমবেশি বারো কিমি দূরে জঙ্গলমহলের বেলিয়া গ্রামের মানুষজনেরা শিক্ষকদিবস আজ পালন করলেন বেলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। আন্তরিকতার ও শ্রদ্ধার বিনম্রতায়, আর জাঁকজমকের অপ্রতুলতায়।

অতি সাধারণ মঞ্চ। শতরঞ্চি, চেয়ার ও বৈদ্যুতিক আলোর যথেষ্ট জোগাড় নেই। এই সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে বেলিয়া গ্রামের ও সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষজন গাছের তলার বেদি, ইঁটের পাঁজা আর স্কুল প্রাঙ্গণের মধ্যে চলাচলের জন্য যে একফুট উঁচু রাস্তা আছে, সেই সব জায়গায় বসে দাঁড়িয়ে সকাল থেকে শুরু করে রাত সাড়ে দশটা–এগারোটা পর্যন্ত উপভোগ করলেন, সক্রিয় যোগদান করে কানায় কানায় ভরিয়ে তুললেন এই অনুষ্ঠানটিকে।

যা যা অনুষ্ঠিত হয়েছে :

• রক্তদান করেছেন একান্ন জন। (এতদ অঞ্চলের এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশি সংখ্যক রক্তদাতা)

• শিশুরা ও অঙ্গনওয়ারির আবালবৃদ্ধবনিতা দুপুরের পংক্তি ভোজনে বসে সানন্দে জমিয়ে গরম গরম খিচুড়ি খেয়েছেন।

• প্রয়াত মাণিক চন্দ্র পালের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের শিক্ষকগণ, তাঁর ছাত্র–গুণমুগ্ধরা এই আদর্শ শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি, ছাত্রদের প্রতি দায়িত্ববোধ, আন্তরিকতা ও তাঁর জীবনযাত্রার সরল ও পরোপকারী দিকগুলি আলোচনা করে।

• পাইক–নৃত্যগুরু শ্রী কালীপদ কালিন্দী ও 'মন্থন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী জিতেন নন্দীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

• কলকাতা থেকে আসা শিল্পীদের পাশাপাশি আঞ্চলিক কবি–শিল্পীরাও গান ও আবৃত্তি করেছেন। এ অঞ্চলের যে সমস্ত গীতিকার ও শিল্পী রয়েছে, তাদের সৃষ্ট গান বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে।

• ঝাড়গ্রাম শহরের আনন্দম নাট্যদল তাদের 'অরণ্য–সংবাদ' নাটকটি উপস্থাপনা করেছে।

লোকগান শিল্পী শ্রী হারাধন জালের সুযোগ্য নেতৃত্বে বেলিয়া গ্রাম তিরিশ বছর পরে এত সুন্দর অনুষ্ঠান উপভোগ করল।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

ভারতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভিমুখ শীর্ষক আলোচনা

শ্রীমান চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর •

'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্রেসি'র পক্ষ থেকে গত ১৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, কোলকাতার কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধী সোসাইটির হলে বর্তমান ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভিমুখ নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিশ্বের দুশ'টি দেশের মধ্যে একাদশতম বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তির দেশ ভারতে প্রতি বছর পেটের অসুখেই কেবল মারা যায় ৮ লক্ষ শিশু। দেশের প্রসূতি মায়েদের মধ্যে ৬০% এবং তিন বছর পর্যন্ত ৭৪% শিশু অপুষ্টি ও রক্তাল্পতার শিকার। বছরে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ যা মোট পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। আমাদের দেশের চিকিৎসায় খরচ মেটাতে প্রায় ৮৫% টাকাই রোগী নিজের পকেট থেকে বহন করে। সরকার ক্রমশ স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্য পরিষেবা ভিত্তিক ব্যবসাকে উৎসাহিত করে চলেছে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কীভাবে ধীরে ধীরে ব্যবসায়িকদের হাতে তুলে দিচ্ছে, সে বিষয়েই বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করলেন ডাঃ হীরালাল কোনার, ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ, ডাঃ অর্ণব সেনগুপ্ত ও শ্রী ফণীভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়।

বক্তাদের মধ্যে প্রথমেই হীরালাল কোনার বলেন, ভারতে পাশ্চাত্য ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের সমস্যা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। যে সমস্ত রোগে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ আক্রান্ত হয়, তার অধিকাংশ নিয়েই আমাদের দেশে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কারণ আমাদের দেশের সম্পূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা পাশ্চাত্যের অনুরূপ। তাই যে যে বিষয়গুলি ওদেশে চর্চিত হয় সেগুলিকে ভিত্তি করেই আমাদের মূল চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তাই ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া, ডাইরিয়া, শিশুদের অপুষ্টি জনিত রোগের মতো বিষয়গুলিতে বহু ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। যেমন বছরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই রোগের প্রাদুর্ভাব যখন বেশি হয় তখন বিশেষ কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণসহ কিছু স্থানিক সমস্যা নিরসনে পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। মাতৃদুগ্ধই শিশুদের অপুষ্টি ও ভবিষ্যৎ রোগ প্রতিরোধের প্রধান প্রতিষেধক, এই তথ্য সরকার প্রচারিত গণমাধ্যম গুলিতেই উপেক্ষিত। সরকারি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের বিজ্ঞাপনে নামি কোম্পানির বেবি ফুডের সম্প্রচারের মধ্যে দিয়ে আমরাই নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছি অন্ধকারের দিকে। অনুষ্ঠানে ড্রাগ কোম্পানিগুলির সাথে চিকিৎসকদের একাংশের অনৈতিক যোগাযোগের সমালোচনা করা হয়। এ বিষয়ে ছোটো ছোটো সামাজিক উদ্যোগ গড়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, হারিয়ে যেতে বসা দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে আরো বেশি করে ফিরিয়ে আনার কথাও বলা হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.